

প্রাচীন গীতিকার গল্প

প্রাচীন গীতিকার গল্প

রূপবতী

গল্প প্রবীর সেন
ছবি কৃষ্ণেন্দু চাকী

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ISBN 0 86125 899 1

ওরিয়েন্ট লংম্যান

রেজিস্টার্ড অফিস
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০০২৯

অন্যান্য অফিস
কামানী মার্গ, বালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০০৩৮
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৭২
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নিউদিল্লী ১১০০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০০০৪
এস সি গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১০০১
পাতিয়ালা হাউস, ১৬ এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬০০১

প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০

প্রকাশক
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০৭২

ফটোটাইপসেটিং
ইউনিক অ্যাকিউরেটস্ প্রাঃ লিঃ
৫৮/৪ এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলিকাতা ৭০০ ০৪৫

মুদ্রক
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০ ০১৫



রানীকে বনবাসে দিল রাজা চক্রধর। রাজার মা কেঁদে বলল, 'বাবা, নিষ্ঠুর হয়ো না, বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দিলে তোমার অকল্যাণ হবে।'

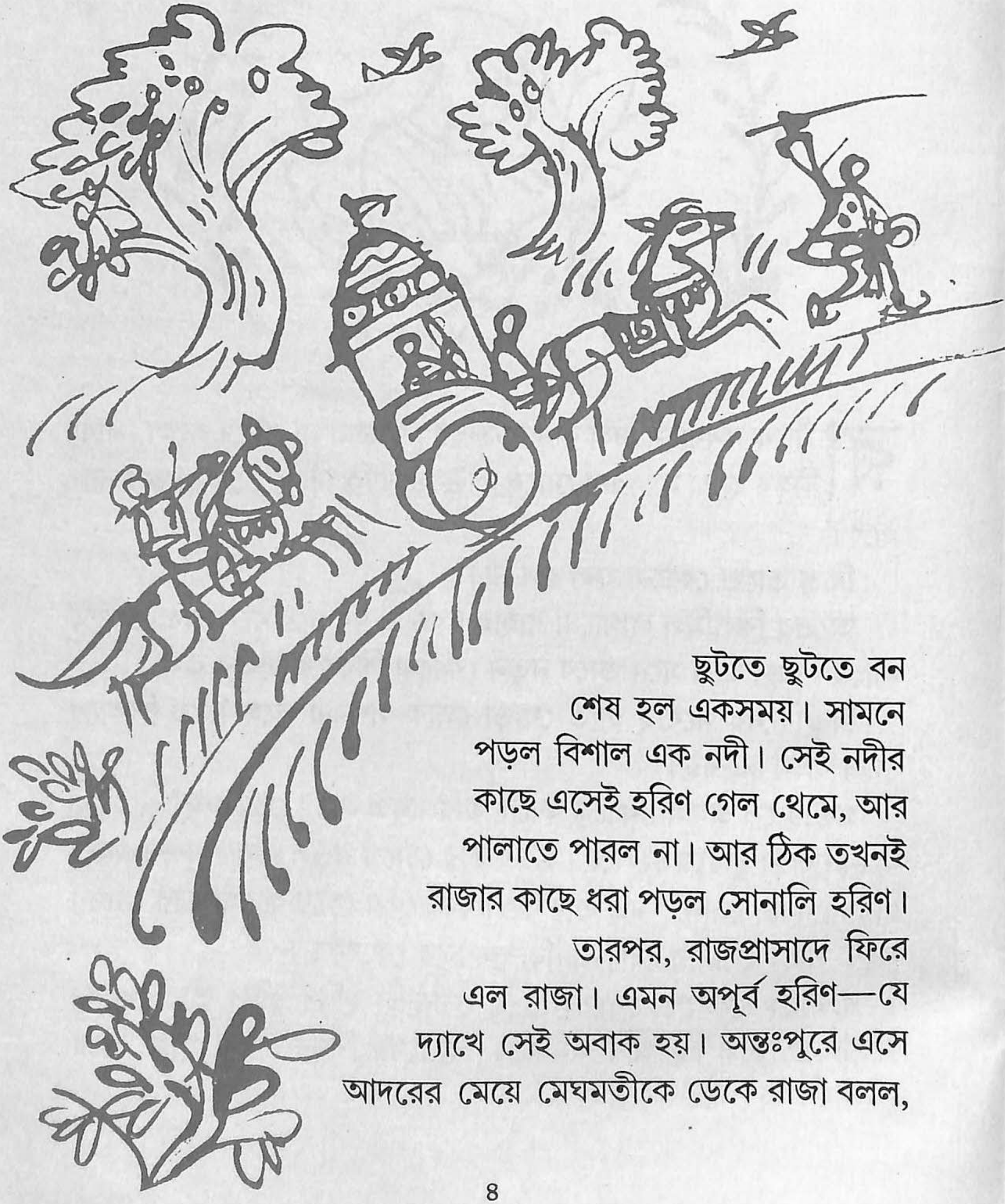
কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না।

অভ্রের ঝিলমিল লাগানো বাহান্ন দরজার দরবারে বসে রাজা রাজত্ব দ্যাখে। আর মনে মনে ভাবে নতুন কোনো শিকারে যাবার কথা।

কিছুদিনের মধ্যেই হাতি-ঘোড়া-লোক-লশকর সঙ্গে নিয়ে শিকারে গেল রাজা চক্রধর।

গভীর সে জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে তার সবুজ মাঠ। সেই জঙ্গলের মধ্যে রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল অপূর্ব সুন্দর একটা হরিণ। কাঁচা সোনার মত তার রঙ। কাজলের চেয়ে কালো তার চোখ। সবুজ মাঠে সোনার রোদে দিব্যি সে চরে বেড়াচ্ছে!

রাজাকে দেখতে পেয়েই সেই সোনালি হরিণ ছুটল তীর বেগে। রাজার ঘোড়াও কি আর কম যায়! হরিণের পিছন পিছন পাল্লা দিয়ে ছুটল সেও।



ছুটতে ছুটতে বন
শেষ হল একসময়। সামনে
পড়ল বিশাল এক নদী। সেই নদীর
কাছে এসেই হরিণ গেল থেমে, আর
পালাতে পারল না। আর ঠিক তখনই
রাজার কাছে ধরা পড়ল সোনালি হরিণ।
তারপর, রাজপ্রাসাদে ফিরে
এল রাজা। এমন অপূর্ব হরিণ—যে
দ্যাখে সেই অবাক হয়। অন্তঃপুরে এসে
আদরের মেয়ে মেঘমতীকে ডেকে রাজা বলল,



শোন শোন, প্রাণের কন্যা কই গো তোমারে।
পেয়েছি সোনার মৃগ যাইয়া শিকারে।
সোনার বরণ তার কাজলের আঁখি।
লাল রঙ শিঙা তার কোথাও না দেখি ।।

মেঘমতী নিজের ঘরে ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল সোনার বরণ সেই হরিণকে। সারাদিন হরিণ নিয়েই কেটে গেল তার। রাত ক্রমে গভীর হল। একে একে রাজপুরীতে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু মেঘমতীর চোখে যেন আর ঘুম নেই! সারা রাত সে চেয়ে চেয়ে রইল!

বাইরে ফুটফুট করছে জোছনা। ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো। বাতাসে কাঁপছে পিলসুজের শিরশিরে বাতি। এমন সময় মেঘমতীর হঠাৎ চোখে পড়ল হরিণের শিঙে বাঁধা একটা ছোট্ট সোনার কবচ। এতো ছোট যে, সহজে চোখেই পড়ে না!

বনের হরিণ, তার আবার শিঙে কী করে এল সোনার কবচ! ভেবে ভেবে মেঘমতী যেই না শিঙ থেকে খুলেছে সেই কবচ, অমনি সেই হরিণ হয়ে গেল অপূর্ব সুন্দর এক রাজকুমার!

তাই দেখে মেঘমতী তো অবাক। নিজের গায়ে চিমটি কেটে দ্যাখে, চোখদুটি কচলে কচলে দ্যাখে, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দ্যাখে, সত্যি এক রাজকুমার আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে!

মেঘমতী তো কম সুন্দর নয়! তার মেঘের মত ঘন একঢাল চুল। তার সদ্যফোটা পদ্মের মত মুখ। আর প্রদীপের শিখার মত উজ্জ্বল চপল দুটি চোখ।

রাজকুমার সেই রূপ দেখে মোহিত হয়ে বলল,

কে তোমার পিতা, কন্যা কী নাম তোমার?
পরিচয়ের জন্য তুমি কহ একবার!

ঝরনার মত স্বরে মেঘমতী বলল, 'নারায়ণগঞ্জের রাজা চক্রধরের মেয়ে আমি। মেঘমতী আমার নাম। কিন্তু তোমার কী পরিচয় রাজকুমার? কেনই বা তুমি হরিণ হয়েছিলে?'

এই শুনেই ছলছল করতে লাগল রাজকুমারের চোখ। গলার স্বর এল ধরে। বলল, 'দণ্ডকপুরের রাজা দণ্ডপতির ছেলে আমি। আমার নাম সুবর্ণকুমার। আমার সৎমাই আমাকে মন্ত্রপুত কবচ দিয়ে হরিণ করে রেখেছিল এতকাল। সেই থেকে মনের দুঃখে আমি বনে বনে ঘুরছি। আজ তোমার জন্যই আমি আবার ফিরে পেলাম মানুষের জীবন।'

রাজকুমারের দিকে অবাক চোখে চেয়ে মেঘমতী বলল, 'আমিও তোমার মত দুঃখী। রাজা আমার মাকে দিয়েছেন বনবাস। আমি যদি জানতাম, আজ কোথায় আছে আমার মা, তাহলে এখুনি চলে যেতাম আমার সেই দুঃখী মায়ের কাছে।'

সারারাত দুজনের কথা আর ফুরোয় না যেন! এদিকে ভোর হয়ে এল বলে! পুব আকাশে দেখা দিল রাঙা আভা। নহবতখানায় বেজে উঠল ভৈরবী।

একে একে লোকজন দাসদাসীর ঘুম ভাঙল। দিনের আলো ফুটতে ফুটতেই মেঘমতীর বুক শুকিয়ে গেল। সোনালি হরিণ যে আসলে সুবর্ণকুমার, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে এখন ? রাজকন্যার ঘরে অচেনা এক রাজকুমার— এ কথা রাজার কানে গেলে রক্ষে নেই যে আর !

সারাদিন তার ভয়ে ভয়েই কাটে। কখন রাত হবে, সেই অপেক্ষায় সুবর্ণকুমার সেই ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রইল সারাদিন।

দিনের শেষে সূর্য বসল পাটে ; সন্ধ্যা নামল চরাচরে। তারপর রাত ক্রমশ গভীর হল। একসময় চাঁদ ডুবে যেতে, জোছনাও মুছে গেল। চারিদিকে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু জোনাকিরা মিটমিট করে আলো জ্বালছে গাছে গাছে।

একসময় সুবর্ণকুমার এসে দাঁড়াল মেঘমতীর সামনে। বলল, 'দিনের আলো ফোটার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে, রাজকুমারী ! এবার আমায় বিদায় দাও !' জল-ছলছল চেখে মেঘমতী কেবল তাকিয়ে রইল। মুখে বলল না কিছু। সুবর্ণকুমার তারপর মেঘমতীর কাছে বিদায় নিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল সেই রাতেই। রাজপ্রাসাদের প্রহরীরা কেউ কোনো টেরই পেল না !

সকাল হতেই হৈ হৈ পড়ে গেল রাজপুরীতে। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল সে কথা। রাজঅন্তঃপুর থেকে রাজকন্যার সোনালি হরিণ পালিয়ে গেছে। রাজার হুকুমে রাজ্যসুদ্ধু লোক সারা রাজ্য তোলপাড় করে ফেলল, কিন্তু কেউই কোনো চিহ্ন পেল না তার।

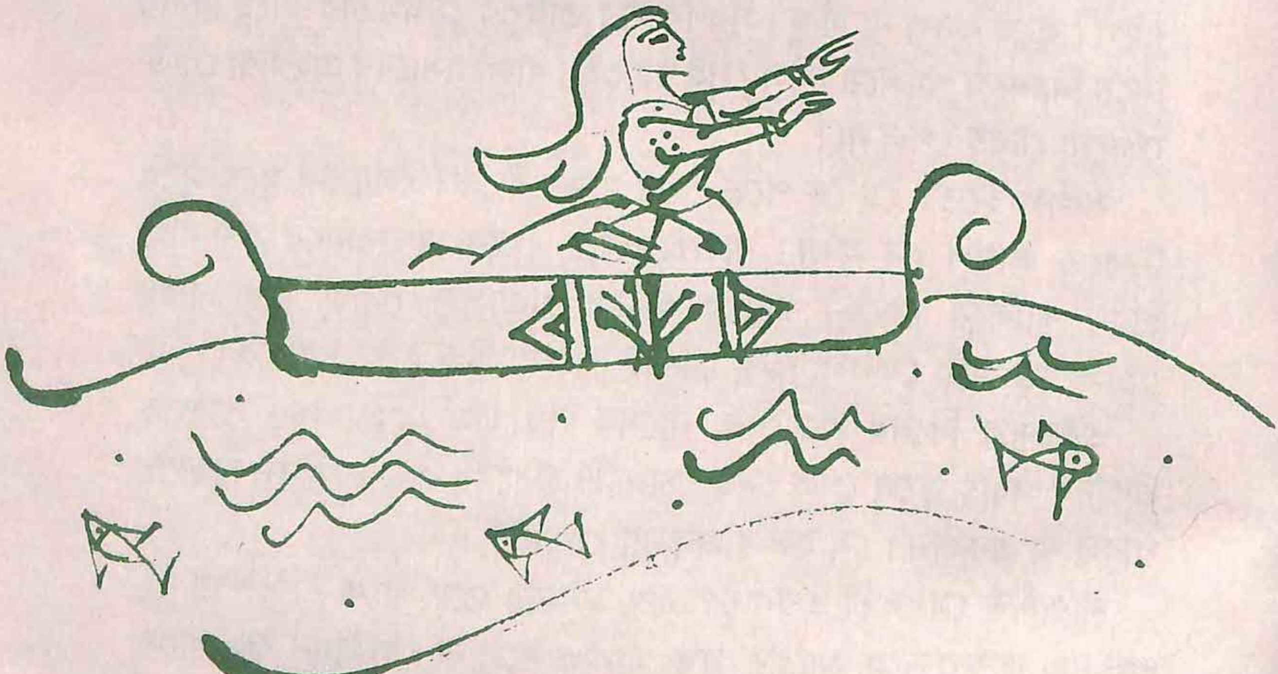
এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলে যায়। তারপর একদিন সবাই ভুলে গেল সেই সোনালি হরিণের কথা। কেবল ভুলতে পারল না একজন। সে হল রাজকন্যা মেঘমতী।

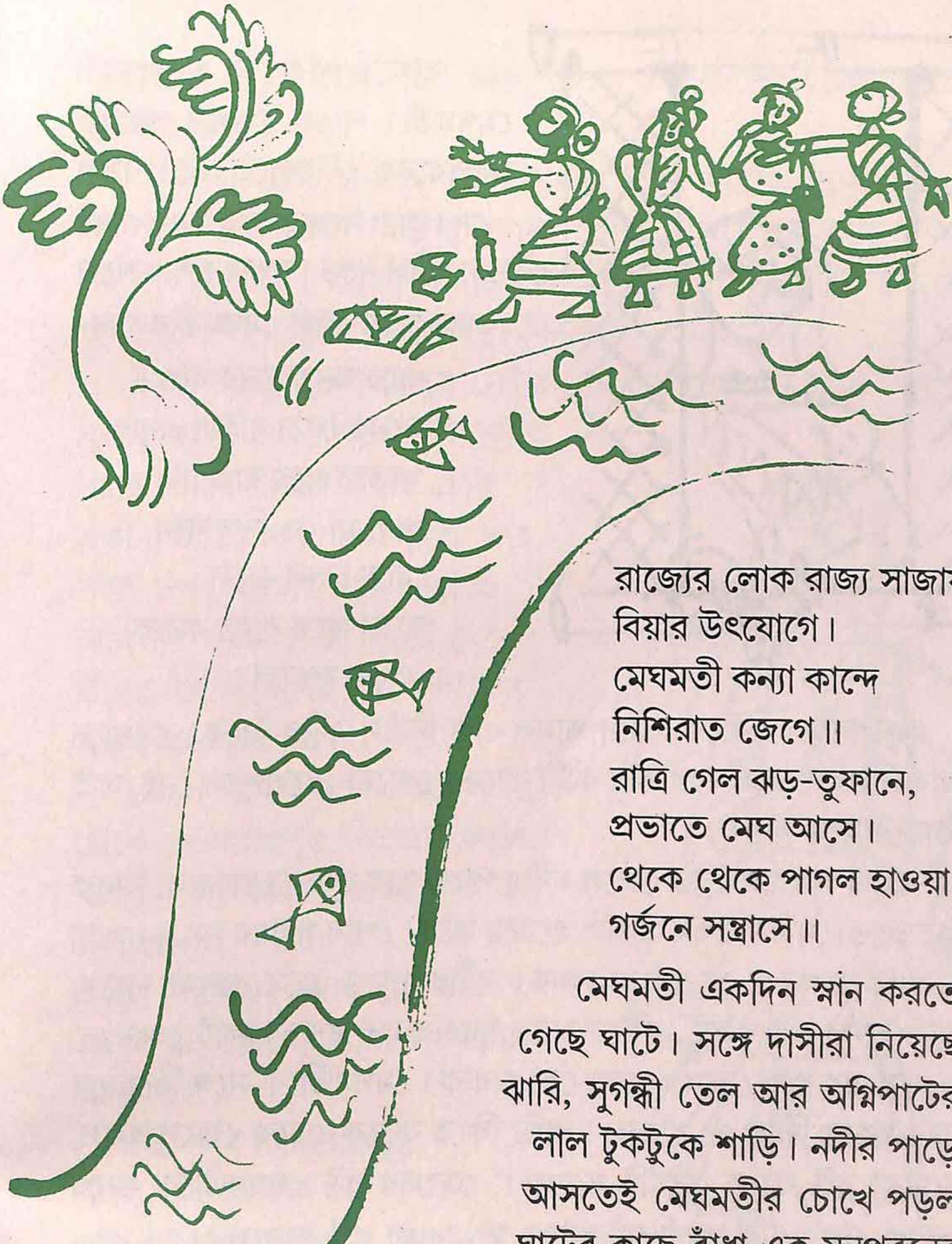
সারাদিন মেঘমতী এখন চুপচাপ, মনমরা হয়ে থাকে। সে খায় না, দায় না ; কারুর সঙ্গে আগের মত কথাও বলে না। রাতদিন শুধু গালে

হাত দিয়ে বসে থাকে আর সুবর্ণকুমারের কথা ভাবে।

ইতিমধ্যে একসময় মেঘমতীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। দুলাই নামে এক রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা। সবই প্রায় ঠিকঠাক। রাজপুরীর সব লোক এখন সে বিয়ের তোড়জোড়েই ব্যস্ত। সেই শুনে মেঘমতীর মাথায় যেন বাজ পড়ল হঠাৎ।

মেঘমতী কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছে, সুবর্ণকুমার ছাড়া অন্য কাউকেই সে বিয়ে করবে না। কিন্তু সুবর্ণকুমারের তো আর কোনো খবরই নেই! কবে আসবে তারও তো কোনো ঠিক নেই। এদিকে বিয়ের দিন যতই এগিয়ে আসে ততই রাজ্য জুড়ে সাজসাজ রব ওঠে। আর মেঘমতীর অবস্থা?





রাজ্যের লোক রাজ্য সাজায়
বিয়ার উৎযোগে।
মেঘমতী কন্যা কান্দে
নিশিরাত জেগে।।
রাত্রি গেল ঝড়-তুফানে,
প্রভাতে মেঘ আসে।
থেকে থেকে পাগল হাওয়া
গর্জনে সন্ত্রাসে।।

মেঘমতী একদিন স্নান করতে গেছে ঘাটে। সঙ্গে দাসীরা নিয়েছে ঝারি, সুগন্ধী তেল আর অগ্নিপাটের লাল টুকটুকে শাড়ি। নদীর পাড়ে আসতেই মেঘমতীর চোখে পড়ল ঘাটের কাছে বাঁধা এক মনপবনের নৌকো। সেই দেখে নিজেকে আর ঠিক



রাখতে পারল না রাজকুমারী মেঘমতী। পলক ফেলার আগেই মনপবনের নৌকোতে উঠে বসল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনপবনের নৌকো উঠল নড়ে। ছপাৎ ছপাৎ শব্দে ঢাকা পড়ে গেল মেঘমতীর গান।

ওরে মনপবনের নাও।
মনের বৈঠা বাইয়া এবার
পাতালপুরে যাও॥
বাবা মা-কে দিল বনে,
মেয়ে চলল জলে।
রাজা সুখে রাজ্য করুক,
দেখুক সকলে॥ ....

মনপবনের নৌকো এসে থামল এক নির্জন নদীর বাঁকে। সেখানে থাকত এক জেলে আর তার বউ। তাদের কোনো ছেলেপুলে নেই, তাই তাদের মনে বড় দুঃখ।

রোজ সকালে উঠে জেলে নদীর পাড়ে যায় মুক্তোর সন্ধানে, ঝিনুক কুড়োতে। সেদিন তখন সকাল হয়েছে সবে। পোষ মাসের ঘন কুয়াশায় চারদিক তখনও আবছা অন্ধকার। নদীর পাড়ে এসে জেলে দ্যাখে, মনপবনের নৌকোতে ঘুমিয়ে আছে ফুলের মত সুন্দর একটি মেয়ে।

মেয়ের রূপ দেখে জেলে তো অবাক! মেঘমতীকে সঙ্গে নিয়ে সে তার ঘরের দিকে পা বাড়াল। বাড়ি ফিরে বউকে ডেকে জেলে বলল, 'দ্যাখো বউ, কাকে এনেছি দ্যাখো!' জেলের বউ মেঘমতীকে দেখে ভাবল ঠাকুর বুঝি এতদিনে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

নদীর ধারে, গ্রামের পথ যেখানে শুরু, সেইখানে জেলের ভাঙা ঘর।

বর্ষাকালে ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে। শীতকালে হিমেল হাওয়া কাঁপিয়ে দেয়।

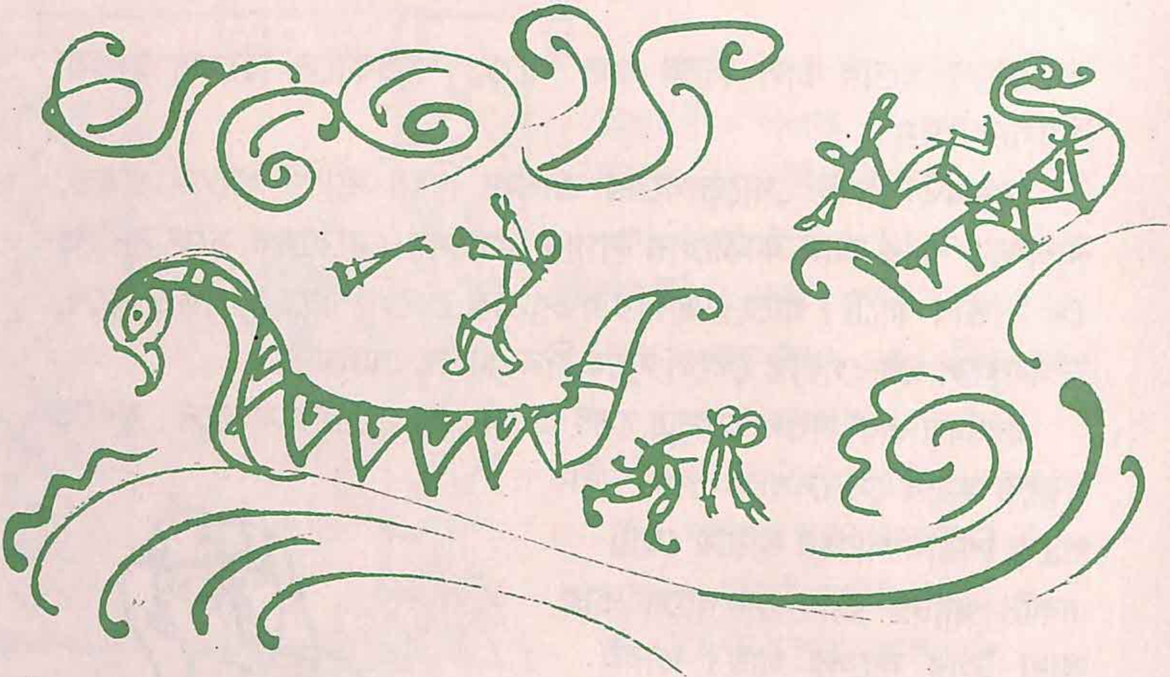
মেঘমতী সেই খোড়োঘরের জানলা দিয়ে দ্যাখে ধানের ক্ষেত, বাঁশঝাড় আর আম-কাঁঠালের বাগান। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে নদীতে সে সাঁতার কাটে। গাছের ছায়ায় বউবসন্তি খেলে, গাছের শিকড়-মূলে, ফল-ফুলে ঘর-গেরস্থি খেলে সুখে দিন কাটায় মেঘমতী।

একদিন এক সওদাগরপুত্র সেই গ্রামে এল মুক্তোর সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সে দেখতে পেল নদীর পাড়ে শিরীষ গাছের ছায়ায় ছোট্ট একটা মাটির ঘর। চারপাশে তার সাদা টগর ফুলের গাছ। তারই জানলায় পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে। তাই দেখে নিমেষেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সওদাগরপুত্র।



জেলে আর জেলের বউকে ডেকে সওদাগরপুত্র জিজ্ঞেস করল, 'এই মেয়েটি কার ? কে এর বাবা মা ?' জেলে বলল, 'নদীর পাড়ে আমি একে পেয়েছি। নাম মেঘমতী। এর আর কোনো পরিচয় আমি জানি না।'

তাই শুনে সওদাগরপুত্র বলল, 'কী তোমার পরিচয় নির্ভয়ে আমাকে বলতে পার।'



মেঘমতী কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল কেবল।

সওদাগরপুত্র অনেক কাকুতি-মিনতি করল। অনেক অনুনয়-বিনয় করে বলল, 'বল, কন্যা। আমি তোমার কোনো বিপদের কারণ হব না।' শেষে মেঘমতী তার এলোকেশের ঢাল নামিয়ে, কাজলকালো চোখ তুলে বলল সব কথা।

সেই শুনে জেলে, জেলের বউ আর সওদাগরপুত্র, তিনজনেই অবাক। সওদাগরপুত্র বলল, 'মেঘমতী, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে নিয়ে যাব দণ্ডকপুর। সেখানে নিশ্চয়ই সুবর্ণকুমারের দেখা মিলবে।'

তাই শুনে জেলে, জেলের বউ বলল, 'তাই ভালো, আহা চাঁপার মতন মেয়ের মুখটিতে এতদিনে বুঝি সুখের আলো মিলবে।'

তারপর ধর্মসাক্ষী করে সওদাগরপুত্র সঙ্গে নিল মেঘমতীকে। নদীর ঘাটে জেলে আর জেলের বউ এল তাদের বিদায় দিতে। তাদের



দেখেই মেঘমতীর চোখ ভরে এল জলে। বৃষ্টির ফোঁটার মত সেই জল গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে।

সওদাগরপুত্র চলেছে সপ্তডিঙায় পাল তুলে। এমন সময় পুব আকাশে দেখা দিল কুচকুচে কালো এক মেঘের পাহাড়। দেখতে না দেখতেই ছেয়ে গেল সারা আকাশ। তার খানিক বাদেই তুমুল বেগে শুরু হল ঝড়-বাদল। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানি চমক আর মেঘের গর্জন।

তুমুল সেই ঝড়ের তোলপাড়ে সওদাগরপুত্রের সপ্তডিঙা একে একে নদীর অতলে তলিয়ে গেল সব। ঢেউয়ের তোড়ে কে যে কোথায় ভাসল তার কোনো ঠিক রইল না।

এদিকে রাজা চক্রধরের রাজত্ব আর যেন চলে না। রাজ্যের সবাই বলে, 'রাজলক্ষ্মী রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাজার পাপেই তো রাজ্যে এত অশান্তি!'

এই শুনে রাজা খুব বিচলিত। নিজের ভুলের জন্য খুব অনুতাপ হল। মন্ত্রীকে ডেকে চক্রধর বলল, 'রানী যেখানেই থাকুক, রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনতে এখুনি লোক পাঠাও।'



রাজার হুকুমে অনুসন্ধানীর দল বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু রানীর সন্ধান তারা কেউ কোথাও পেল না। বিফল হয়ে ফিরে এল রাজার লোক। শেষে রাজা নিজেই বেরিয়ে পড়ল রানীর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে হালুআদের গ্রামে এসে রাজা শুনল, সেখানে এক রানী ঘর বেঁধে আছে। হালুআরা নৌকোর হাল টানে আর জমিতে চাষবাস করে। তারা সেই রানীমাকে মালক্ষ্মীর মত ভক্তি করে। তারই জন্য নাকি সেই গ্রামে ফসল হয় দ্বিগুণ! কোনো ঝড় তুফান নেই দেশে! হাজা-শুখাও নেই! মানুষ না খেয়ে মরে না; তাদের ভাত কাপড়ের দুঃখও নেই। হালুআরা বলে রানীমা আসতেই নাকি তাদের এত বাড়বাড়ন্ত, সুখশান্তি।

একথা কানে যেতেই রাজা ছুটে গেল সেই রানীর কাছে।

এই বিজন বিভুঁয়ে রাজাকে দেখে ভারি আশ্চর্য হল রানী। পা ধোবার জল দিল, আসন পেতে বসতে দিল, থালা ভরে ফল দিল। রাজার সব অপরাধ হাসিমুখে ক্ষমা করে দিল রানী। রাজা তবুও কাতর কণ্ঠে বলল, 'তুমি ক্ষমা কর রানী। আমার ভুলের শাস্তি আমি পেয়েছি যথেষ্ট। প্রজারা দেশে তোমার জন্যে এখনো দুঃখ করছে। রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে সুখ শান্তি। এবার তুমি ফিরে চল রাজপ্রাসাদে।'



এই কথা শুনে হালুআরা কাঁদতে লাগল আকুল নয়নে। তাদের রানীমাকে তারা কিছুতেই ছাড়বে না। রাজা তখন আদরভরে অভয় দিয়ে বলল, 'এবার থেকে প্রতি বছরই রানীমা কিছুদিন তোমাদের কাছে এসে থাকবে। তোমরা এখন তাকে নিজের ঘরে যেতে দাও।' রানী হালুআদের কাছে বিদায় নিয়ে চোখের জল আঁচলে মুছে নৌকোতে উঠল। তারপর হাওয়ায় পাল তুলে ভেসে চলল নারায়ণগঞ্জের রাজপ্রাসাদে।

রাজপ্রাসাদে এসে রানী দ্যাখে সবাই সেই আগের মতই আছে; কেবল মেঘমতী

কোথাও নেই। যে আসে দেখা করতে তাকেই রানী মেঘমতীর কথা শুধায়। কেউ কোনো উত্তর দেয় না। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কেবল। রানী তখন রাজাকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার মেঘমতী কোথায় আছে বল ?'

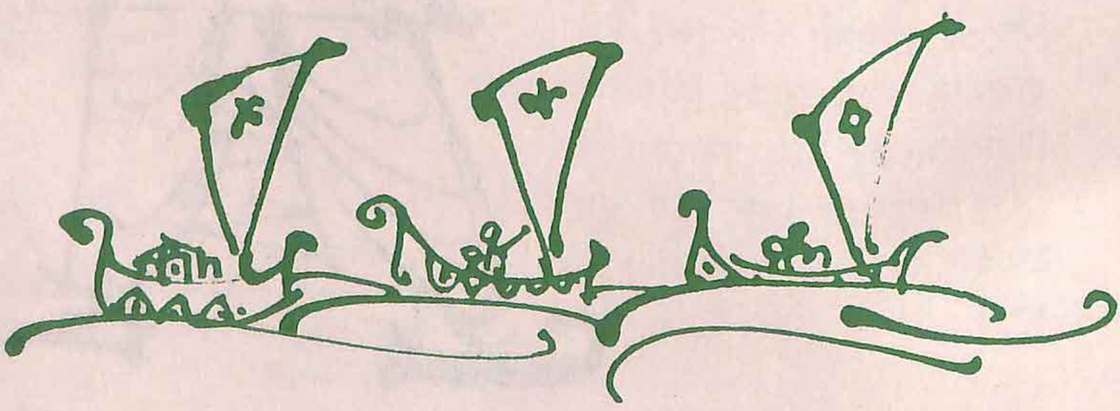
এই কথা শুনে রাজা কথা না কহিল।
রানীর সুন্দর মুখ কালো হইয়া গেল ॥
মেঘমতীর ধাই কাইন্দ্যা কহিল সমুদয়।
শুনিয়া বিত্তান্ত রানী কথা নাহি কয় ॥

মেঘমতী যে এখন কোথায়, তা কেউ জানে না।

ওদিকে অকূল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে এক অজানা দ্বীপে এসে উঠেছে সওদাগরপুত্র। সেখানে জনমানুষ নেই। গাছের ফলমূল খেয়ে কোনোমতে সে বেঁচে আছে।

একদিন এক কাঠুরের দল কাঠ কাটতে এল সেই দ্বীপে। নির্জন সেই দ্বীপে সওদাগরপুত্রকে দেখে তারা তো অবাক।

কাঠুরেদের দেখে সওদাগরপুত্র বলল, 'আমি সওদাগরের ছেলে। আজ থেকে কয়েকমাস আগে আমার সব নৌকো সমুদ্রের ঝড়ে ডুবে গেছে। আমার সঙ্গী-সাথীরা কে যে কোথায় ভেসে গেছে, তার কিছুই আমি জানি না। কোনোমতে ভাসতে ভাসতে এই অজানা দ্বীপে এসে পড়েছি আমি।'



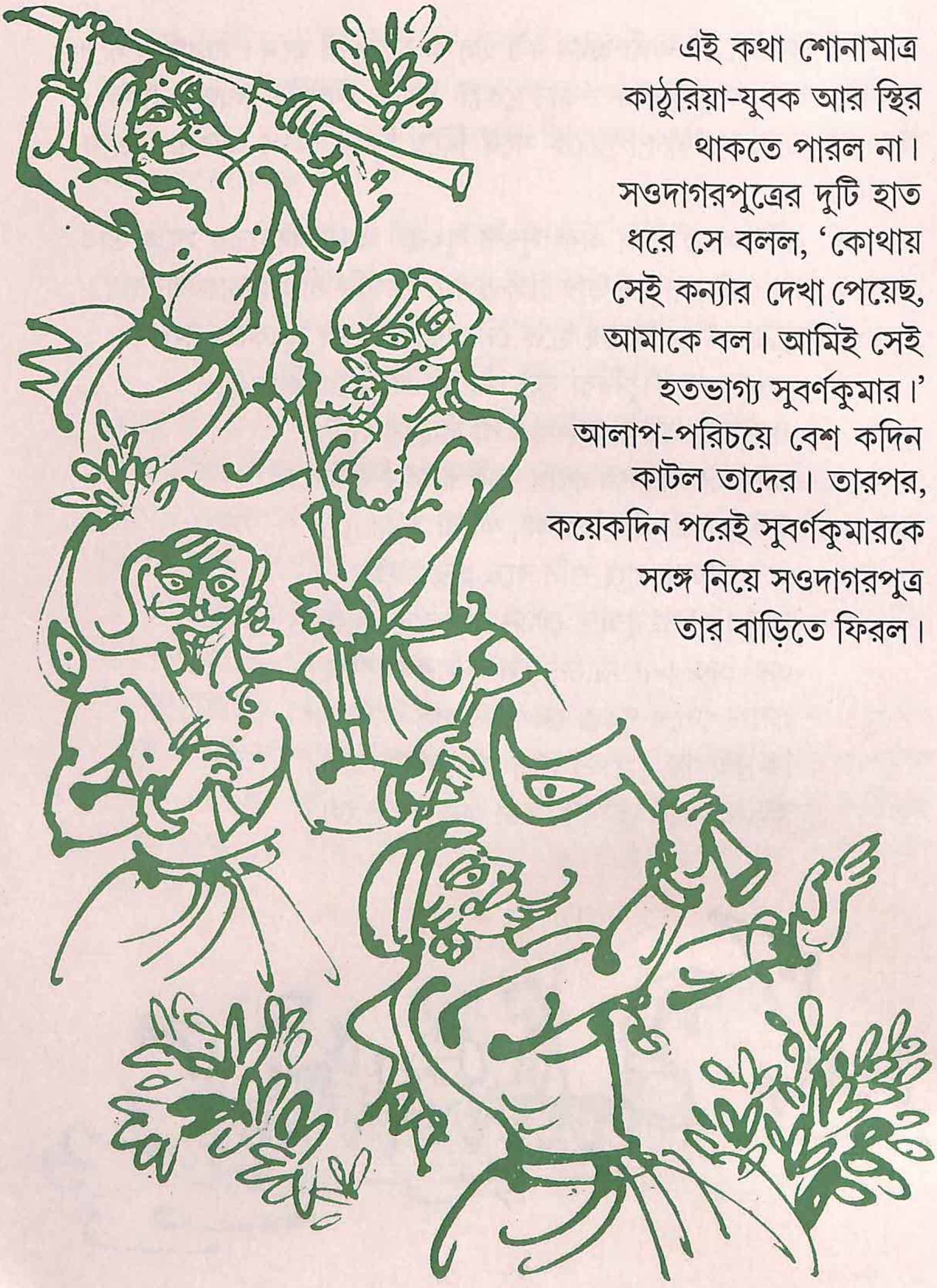
সওদাগরপুত্রের কথা শুনে কষ্ট হল কাঠুরেদের মনে। সারাদিন ধরে জঙ্গল থেকে কাঠুরের দল কাঠ কেটে কেটে বোঝাই করল নৌকো। তারপর তারা সওদাগরপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলল আবার উজান সামলে।

সেই নৌকোতে ছিল এক সুন্দর যুবক। অন্য কাঠুরের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। যেমন তার চাল-চলন, তেমনি তার আচার-ব্যবহার। সওদাগরপুত্রের মনে সন্দেহ হতে সে একদিন সেই যুবককে বলল,

শুন শুন কাঠুরিয়া ভাই, আমি তোমারে জিগাই।
কাঠুরিয়া হইলা তুমি কি বা কিসের লাই॥
আকারে প্রকারে দেখি তুমি রাজার কুমার।
কে বা তোমার বাবা মা, কী বা সমাচার॥
এক রাজার পুত্র শুনি বনে হরিণ হইল।
মানুষ হইয়া কুমার কোন বা দেশে গেল॥
এক রাজকন্যা দ্যাখো সে-কুমার লাগিয়া।
দেশে দেশে ঘুইরা ফেরে তল্লাস করিয়া॥
কি কইবাম দুঃখের কথা এক সন্ধ্যাকালে।
ঝড় তুফানে ডুইব্যা ডিঙা কন্যা পাতালে॥



এই কথা শোনামাত্র কাঠুরিয়া-যুবক আর স্থির থাকতে পারল না। সওদাগরপুত্রের দুটি হাত ধরে সে বলল, 'কোথায় সেই কন্যার দেখা পেয়েছ, আমাকে বল। আমিই সেই হতভাগ্য সুবর্ণকুমার।' আলাপ-পরিচয়ে বেশ কদিন কাটল তাদের। তারপর, কয়েকদিন পরেই সুবর্ণকুমারকে সঙ্গে নিয়ে সওদাগরপুত্র তার বাড়িতে ফিরল।



বাড়িতে এসেই তারা দুই বন্ধুতে ঠিক করল, যে করেই হোক, মেঘমতীকে খুঁজে বের করতেই হবে। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তারা দেশান্তরে।

এক দেশ থেকে আরেক দেশ, এক বন্দর থেকে আরেক বন্দর। কেবল খোঁজে আর খোঁজে। কোথাও কোনো সন্ধান নেই মেঘমতীর। এইভাবেই চলল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।

হঠাৎই একদিন রাতে তাদের নৌকো ঘিরে ফেলল ভোলা ডাকাতের দল। যা ছিল সব তারা লুঠ করল। মাঝিমাল্লারা যে যেখানে ছিল, প্রাণের ভয়ে ঝাঁপ দিল নদীতে। সওদাগরপুত্র আর সুবর্ণকুমারকে ডাকাতরা বেঁধে নিয়ে গেল তাদের আস্তানায়।

ঘন গভীর জঙ্গলের মধ্যে সে এক পাষাণপুরী। সুবর্ণকুমার আর সওদাগরপুত্রকে সেই পাষাণপুরীর এক ঘরে বন্দী করে রাখল ভোলা ডাকাতের সাঙাতরা।





রাত ফুরোতে, পরের দিন সকাল হল। জানলা দিয়ে উঁকি দিল ভোরের আলো। বনের পাখি ডাকল ; আস্তে আস্তে চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সময়ে সওদাগরপুত্র দেখতে পেল, দূরে ভাঙা প্রাসাদের একপাশে চাঁপা ফুলের ঘন বন। সেই চাঁপার বনে, সাজিতে করে ফুল তুলছে একটি মেয়ে।

খানিক বাদেই কারাগারের দরজা খুলে গেল। ডাকাতদের একজন এসে তাদের নিয়ে গেল পাষাণপুরীর অন্দরমহলে।

ভাঙা সেই প্রাসাদের মস্ত এক ঘরে বাস করে ডাকাতদের সর্দার ভোলা ! রক্তজবার মত তার চোখ। মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সোনার মাকড়ি তার কানে। আবলুস কাঠের মত তার গায়ের রঙ।

সওদাগরপুত্র আর সুবর্ণকুমারকে দেখে বাজখাঁই গলায় ভোলা বলল, 'কে তোমরা ? সত্যি করে বল ?'

সওদাগরপুত্র ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি সওদাগরের ছেলে। দেশে দেশে বাণিজ্য করে ঘুরে বেড়াই। আর এ আমার বন্ধু, এর নাম সুবর্ণকুমার।'

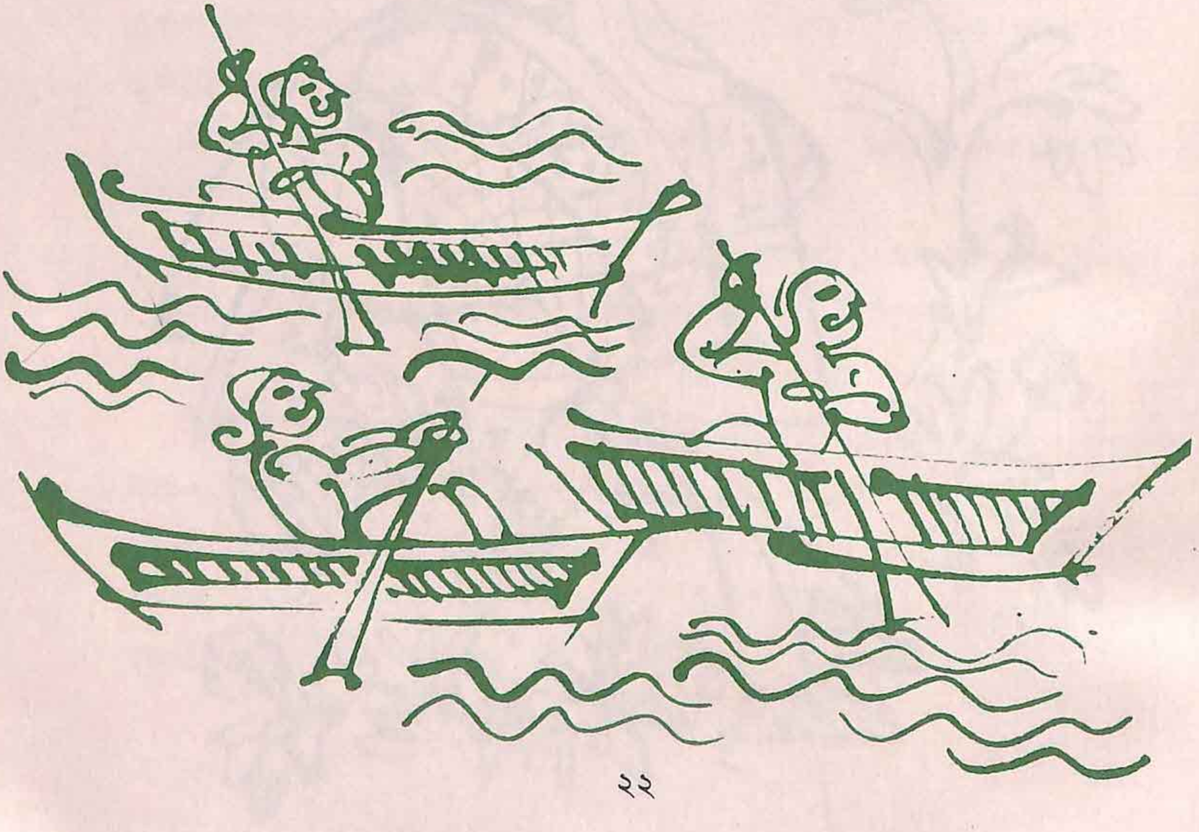
সুবর্ণকুমার বলল, 'আমার বাবা দণ্ডকপুরের রাজা ছিলেন। আমার সৎমা অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে। সেই সৎমা তার ছেলেকে সিংহাসনে বসাবার লোভে আমাকে করেছিল এক সোনার হরিণ। একদিন রাজা চক্রধর আমাকে বন থেকে ধরে, তার মেয়ে মেঘমতীর কাছে এনে দেয়। সেই মেয়ের জন্যেই আমি ফিরে পেয়েছি আবার এই মানুষের জীবন। তারপর আমি দণ্ডকপুরে ফিরে গিয়ে দেখি সৎমার ছেলেই রাজা হয়েছে। আমার পরিচয় শুনে সে আমাকে বন্দী করে রাখল কড়া



নজরদারিতে। সেখান থেকে কোনোমতে পালিয়ে এসে আমি কাঠুরিয়াদের সঙ্গেই লুকিয়ে ছিলাম কত দিন!'

এমন সময় সকলকে অবাক করে দিয়ে ঘরের একপাশের চিকের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল মেঘমতী। ভোলা ডাকাত আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তো অবাক! সুবর্ণকুমার বলল, 'এই পাষাণপুরীতে তুমি কী ভাবে এলে মেঘমতী?' একথা শুনে মেঘমতী অঝোরে কাঁদতে লাগল।

ভোলা সর্দার বলল, 'অনেক দিন আগের কথা। প্রচণ্ড ঝড় বাদলের দিন। ডাকাতি করে নিজের আস্তানায় ফিরছি এমন সময় দেখি নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে একটি মেয়ে। তখন তাকে তুলে এনে নিজের আস্তানায় ফিরলাম। আর এর স্নেহেই আমরা সকলে আজ বাঁধা পড়ে গেছি। ওকে আমি নিজের মেয়ের মতই পালন করেছি এতদিন।



তোমাদের ভাগ্যই আজ তোমাদের এখানে এনেছে। কোনো ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে থাক।'

এই বলে ভোলা ডাকাত আর সব ডাকতদের খবর দিল। ডাকাতদল একজোট হতেই ভোলা বলল, 'যাও দণ্ডকপুরে—' অমনি সবাই বেরিয়ে পড়ল দণ্ডকপুরের দিকে।

হুমড়া ডাকাত ঝুমড়া ডাকাত।
ডাকাত সোনা হাতি॥
পাহাড়তলে ডাকাত আইল।
দুহাত বুকের ছাতি॥
বোসাঙ্গ্যা ডাকাত আইল বাঘের মত মুখ।
পাহাড় গাবুর ডাকাত সে তো রক্তবর্ণ চোখ॥
হাজারে হাজারে ডাকাত নাও কেশা লইয়া।
ভোলার সঙ্গে চলে তারা ব্রহ্মপুত্র বইয়া॥

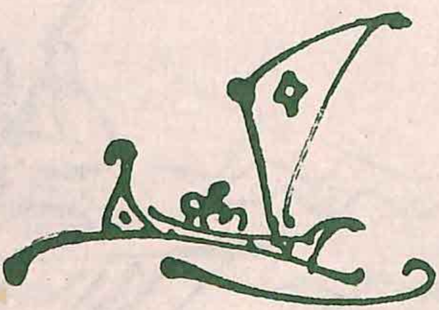


এই কথা যখন দণ্ডকপুরে পৌঁছল তখন সকলেই ভয়ে অস্থির। ডাকাতের ভয়ে বাড়ি ঘর ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাল সবাই। আর ভোলা ডাকাত সুবর্ণকুমারকে ফিরিয়ে দিল দণ্ডকপুরের সিংহাসন।

সেই শুনে রাজ্যসুদ্ধু সবাই ফিরে এল আবার। বহুদিন পর দণ্ডপতি ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল। আর সেই ফাঁকে পালিয়ে গেল সৎমা তার ছেলেকে নিয়ে গোপনে রাজ্য ছেড়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল মেঘমতীর সঙ্গে সুবর্ণকুমারের বিয়ের দিন। খবর পেয়ে মেঘমতীর বাবা-মা দণ্ডকপুরে এল। সওদাগরপুত্র আনল সেই জেলে আর জেলের বউকেও।

সবার মিলনে গাছে গাছে ফুল ফুটল। শুকনো নদীতে এল জোয়ার। আর টুকটুকে লাল ফুলের বাসরে, লাল চেলী আর লাল সিঁদুরে ধুমধাম করে মেঘমতীর বিয়ে হয়ে গেল।



চক্রধর রাজার একমাত্র কন্যা, মেঘমতী। মেঘমতীর দিন কাটে বিশাল রাজপুরীর অন্দরমহলে, আর রাজার দিন কাটে তাঁর অভ্রের ঝিলমিল লাগান বাহান্ন দরজার দরবারে বসে। একদিন মেঘমতী স্নান করতে গিয়ে দেখল নদীর ঘাটে ভেসে রয়েছে এক মনপবনের নৌকো। সেই নৌকোতে উঠে বসল সে। হঠাৎ আপনা থেকেই হাওয়ার বেগে ছুটে চলল নৌকো। ভরা নদীতে উঠল সাংঘাতিক ঢেউ। পুব আকাশে ঘনিয়ে এল কালো মেঘ।

এই পালাগানগুলোর বিষয়বস্তু বহু যুগ ধরে গ্রামীণ কবিদের মধ্যে প্রচলিত। মূল পালাগানগুলো সবই কবিতার আকারে লেখা এবং অনেক লেখাই রূপকথার কাঠামোকে কেন্দ্র করে। মেঘমতী সেইরকমই একটি রূপকথা। এই গীতিকাটি ছোটদের জন্য সহজ সুন্দর গদ্যে রূপান্তর করেছেন প্রবীর সেন। ছবি এঁকেছেন কৃষ্ণেন্দু চাকী।

ওরিয়েন্ট লংম্যান
Meghmati: Traditional Bangla Fairy Tale
ISBN 0 86125 899 1
Price Rs 12.50